ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 633-640
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.052

শচীন দাশের গল্প : সুন্দরবনের বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম

সমরেশ বাগ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

When the word Sundarbans comes to mind, we think of it as forest or jungle. The Sundarbans is an island surrounded by mangroves at the mouth of the Ganges and Brahmaputra. In short, the Sundarbans is a region full of thrills in the water and the jungle. It is the largest delta in the world. It is said that in ancient times it was called the Angiri forest. There is no exact information about when it became the Sundarbans after going through many paths of evolution. It is believed that the name Sundarbans was derived from the fact that a large number of Sundari trees grow there. However, there is controversy about this naming. But whatever the controversy, what was once a forest has now been cut down to a large extent and is now a township. And people have converted the forest into a township. And this township is today's Sundarbans. In the Sundarbans, forests and roads are located side by side and the salty water there meets the sea through narrow and thick river creeks. The island land of the Sundarbans is shaken by the tides, and there is a constant struggle for survival. There are crocodiles in the water and tigers on the shore. But even with crocodiles in the water and tigers on the land, the people are constantly fighting there for survival. And if the man among the family members is lost in that fight, how difficult it becomes for a woman to survive alone. Through how many adversities she has to move forward, to survive. This article has tried to highlight that life pain.

Keywords: Sundarbans, tiger-widow, women's livelihood, child rearing, protecting women's honor, government assistance.

শচীন দাশ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বসবাসকারী একজন বাঙালি লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালের ২ জুলাই কলকাতায়। কলোনি জীবনের নানা দুঃখ কষ্ট মাখা সময়ের মধ্য দিয়ে যখন জীবনের এক-একটা দিন অতিবাহিত করছিলেন। অন্তরে তীব্র একটা বাসনা লালিত হচ্ছিল নতুন কিছু শুরু করার, জীবনকে নতুন রঙে সজ্জিত করার। হাতে তুলে নিলেন কলম। লিখতে শুরু করলেন। আর এই লেখালেখির সূত্র ধরেই তথ্য সংগ্রহের আশায় দক্ষিণের বাধা অঞ্চলকে নিজের চোখে দেখা। দেখলেন এ এক ভিন্ন পৃথিবী।

চারপাশে নদী-নালা, খাল-বিলে ভরা আলাদা এক জগৎ। সেখানে মানুষের জীবন যুদ্ধের পৃথক কাহিনি আছে। কোনও উৎসবে একত্রে তারা যেমন আনন্দ করে আবার সামান্য কারণে একে অপরের সাথে ঝগড়া করে। এমন এক ভিন্ন পৃথিবীর সন্ধান শচীন দাশকে আকর্ষণ করে। তিনি সেখানকার নারী পুরুষদের জীবন যুদ্ধের ছবি নিজের চোখে দেখলেন। আর তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হলেন। আমরা এই প্রবন্ধে শচীন দাশের সুন্দরবন কেন্দ্রিক নির্বাচিত গল্পে বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে আলোচনা করবো।

> "সমগ্র সুন্দরবনের এক সামগ্রিক রূপ প্রলম্বিত হয়ে আছে আবহমান কাল থেকে - এর ইতিহাসে, এর ঐতিহ্যে, এবং এর কৃষ্টিতে। আজও সে রূপ প্রকটিত হয়ে আছে এ অঞ্চলের মানুষের সমাজে বনওয়ালিদের মাধ্যমে"[১]

'বনওয়ালি' বন্য শব্দ। জনপদী সুন্দরবনের ভয়াল-ভয়ঙ্কর জীবন যাপনের অভ্যস্ত এক শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ। যারা সখে নয়, সুখের খোঁজে বনে যায়। খিদে পেলে খেতে পেলে তাদের সুখ। আর শান্তি যতটা না শ্মশানে, তার চেয়ে বেশি সুন্দরবনে। এই অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ এমনটাই মনে করে। তাই সুখ ও শান্তি এই দুয়েরই ঠিকানা তারা খুঁজে ফেরে জল ও জঙ্গলের মধ্যে। এই সহজ সরল মানুষগুলো ভয়ঙ্কর হিংস্র জঙ্গলের কোলে লালিত পালিত হতে হতে বনকেই তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। তারা জীবনের এই সত্যকে স্বীকার করে নেয় যে বনেই তাদের জীবন আর বনেই মৃত্যু। তাই বনের সাথে তাদের মিত্রতা। তারা পরস্পরকে সমানভাবে যেন বোঝে। তাই এই জঙ্গলের সাথে কোনরূপ ছলনা করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। আর ছলনা করলেও তারা জানে এর ফল তাদের পেতেই হবে।

বনজসমাজে এই মানুষেরা জীবিকা ভেদে কেউ বাওয়ালি, কেউ মৌলে, আবার কেউ জেলে, কেউ বা কাঁকড়া শিকারি। এদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কেউ আবার গুনিন বা ওঝা। হিংস্র জন্তুদের মুখবন্ধন, বেড়বন্ধন করে কাঁটাপথ পরিষ্কার করা এদের কাজ। কিন্তু সব সময় তাদের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। খাদ্য-খাদকের তাগিদে বাঘ সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখে এবং সময় বুঝে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে মুখে তুলে পাড়ি দেয় নিজের গন্তব্যে। এভাবেই চলতে থাকে বাদা অঞ্চলে মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্প। আমরা শচীন দাশের গল্পের মধ্য দিয়েও দেখতে পাই ঠিক এভাবেই কেউ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে কেউ বা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের হামলায় প্রাণ দিয়েছে। আর পরিবারের কর্তার অনুপস্থিতিতে বাদা অঞ্চলে একা মহিলার জীবন সংগ্রাম কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা-ই কয়েকটি গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করবো।

'হেঁতালের মানুষেরা' গল্পে দেখা যায় নয়ানির দুটো ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে বাস। একটির বয়স সাত বছর আর অন্যটির বয়স পাঁচ বছর। নয়ানির স্বামী তিনকড়ি এক মধুসংগ্রহের গোনে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তার বিশ্বাস তিনকড়িকে বনবিবি জঙ্গলে ডেকে নিয়েছে। কারণ আগের মধু সংগ্রহের গোনে গিয়ে তিনকড়ি জঙ্গলের নিয়ম ভেঙ্গে বনবিবির জঙ্গলে অর্পণ করা কারোর হেঁতালের চারা সবার অলক্ষে তুলে বাড়িতে এনেছিল। এ বিষয়টা নয়ানির ভালো না লাগলেও কিছু বলতে পারেনি স্বামীকে।

স্বামীহীন অবস্থায় তাকেই দুই ছোট ছোট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে জীবনযুদ্ধে নামতে হয়। বেরিয়ে পড়তে হয় দুই ছেলেকে পাশে নিয়ে একটা হাতজাল ও একটা বড়ো মাটির হাঁড়ি নিয়ে। এরপর হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি

তুলে নদীর বুকে চলতে থাকে জীবন রসদ সংগ্রহের খেলা। নয়ানির চোখ তখন ঘুরতে থাকে নদীর এদিক থেকে ওদিক। কোথায় খেলে বেড়াচ্ছে বাগদার পোনারা। আর লেখকও এ সম্পর্কে বলেন–

> "এদেশে ডিম পাড়ার সময় হলে সমুদ্রের কড়া নোনাজল থেকে বেরিয়ে এসে কম নোনা জলের নদীনালায় ঢুকে পড়ে বাগদারা। বঙ্গোপসাগর থেকে সপ্তমুখী, জামিরা, গোসাবা ও মাতলা হয়ে কোটিতে কোটিতে শত শত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। পড়েই ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো সব কুয়াশার দানার মতো মিহি হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে তখন নদী নালায় তা ডিম ছাড়লো। এবং ওই ডিম থেকেই পরে সরু সুতোর মতো লার্ভা। লার্ভার আবার বড় হতে হতে একসময় পরে বাগদার মীন। কম নোনা জলে হেসে খেলে বেড়ায়। একটু বড় হলে অবশ্য ফের তাদের সেই সমুদ্রেই ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ফিরতে আর পারে না। তার আগেই তারা বাঁধা পড়ে হাতজালে। এদেশের গরিবগুর্বোরা তাদের ধরে ফেলে"[২]

লেখকের উদ্ধৃতির এই বক্তব্যে কতদূর সত্যতা আজও আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি। কোনও একদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দেখা যাবে অনেকেই চিংড়ির মীন ধরতে ব্যস্ত।

আমরাও গল্পে দেখি নয়ানি নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখন ঝুপ করে নেমে পড়েছে নদীর জলে। হাতে তার টানা জাল। এরপর জালটা জলে ডুবিয়ে জালের দড়ি ধরে চলতে থাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এরপর সেই জালে পড়া বাগদার মীনগুলো একে একে হাঁড়িতে ভর্তে থাকে। এভাবেই ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে নদীর বুকে নয়ানির জীবন সংগ্রাম। ছেলে দুটো তখন নদীর পাড়ে মায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে হাঁটতে থাকে। শেষে নয়ানি তার সারা দিনের মীন সংগ্রহের পর তা নিয়ে দাঁড়ায় মহাজনের আরতে। মীন বিক্রি করে যা পায় তা দিয়েই তার চলে যায়। অবশ্য তার চাহিদাও সামান্য।

> "বছরে দুটো মোটা কাপড় ও কচিকাচার শানকিতে দুটো মোটা চালের নুনভাত তা জুটলেই তারা খুশি"[৩]

অবশ্য এ জীবিকায় বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। মীন ধরার ব্যস্ততায় তাদের চারিপাশের জ্ঞান থাকে না। আর এইসব নদী-নালায় নিঃশব্দে জলের নিচে ঘুরতে থাকে কামটের দল। তাদের দাঁত সুতীক্ষ্ণ ধারালো। যখন সেই দাঁতের মুখে কোনও ব্যক্তির পা পড়ে সে বুঝতেই পারে না কেন হঠাৎ করে জলের ভেতরে পা বসে গেল। আর যখন বুঝতে পারে, দেখে তার চারপাশের জলের রঙ লাল। তখন তীব্র যন্ত্রণামাখা আর্তনাদ ছাড়া মুখ থেকে কোনও শব্দ নির্গত হয় না।

আর এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখি 'জল-মানুষ' গল্পের ছায়ানিকেও। ছায়ানির স্বামীর নাম ধান্য। মধু সংগ্রহের গোনে গিয়ে ধান্য আর ফিরে আসেনি। বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। তারপর থেকে ছায়ানিকে নিজের পেটের চিন্তা নিজেকেই করে নিতে হয়েছে। নদী-নালা থেকে মীন ধরে বিক্রি করে উপার্জন। তবে এই দৃশ্য কেবল ছায়ানির একার ঘরের নয়, এই দৃশ্য গ্রামের অনেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়। তাই জলদস্যু ধরতে আসা পুলিশ অফিসারকে ছায়ানির পরিচয় দিতে গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য ভূষণ পাখিরাকে বলতে দেখা যায়–

> "কী করবে... ধান্যটা মধু আনতে গিয়েই বাঘের পেটে গেল...ওই সেই থেকেই তো... এ গেরামে এমন অনেক ঘরেই পাবেন স্যার..."[৪]

তবে সব মহিলারাই যে কেবল মীন ধরা জীবিকার সাথে নিজেকে যুক্ত করে তা নয়। কোনও কোনও মহিলা অন্য জীবিকিও বেছে নেয়। যেমন 'সবুজ কাঁকরা' গল্পে দেখা যায় মান্যর পিতা দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে মধু আনত। কিন্তু একদিন গোনে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বাঘের মুখে জীবন দেয়। আর তারপর থেকে মান্যর মাকেও জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়। সে কাজ করে ভেড়িতে। তার কাজ হল চিংড়ির বাছাই। বিভিন্ন সাইজের, ধরনের চিংড়ি বাছাই করে রাখা। এরপর সেগুলি বরফভর্তি বাক্সবন্দী করে চালান দেওয়া। এই কাজ করতে করতে মান্যর মায়ের সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেটে যায় ভেড়িতে।

কাজের পর শেষ বেলায় ঘরে ফেরা। কিন্তু তখনও জীবনের শান্তি নয়, হাতে তুলে নিতে হয় সংসারের কাজ। জ্বালানি যোগাড় করে উনুন ধারাতে হয়। তারপর ভাত বসানো। এভাবেই জীবন যুদ্ধ চলতে থাকে নিত্যদিন। তবে এই গল্পে দেখা যায় মান্যর মায়ের দুঃখের অংশিদার হয়েছে মান্য নিজেও। তার বয়স পনেরো বছর। তার মা যেমন সকালে উঠে কাজের জায়গায় যায়, মান্য নিজেও সকালে উঠে বিভিন্ন নদী-নালায় খুঁজতে থাকে কাঁকড়া। তার একটা কাঁকড়া ধরা কলও আছে। আর সেই কল সম্পর্কে গল্পে হৈমু জানতে চাইলে, মান্য তাকে বলে–

> "একটা লোহার তার নিয়ে তার মাথাটা বেঁকায়ে ধইরে গর্তে ঢুকিয়ে দাও অমনি দেখবে সেই লোহাটা খপ করে কামড়ে ধরবে গর্তের কাঁকড়াটা। ব্যাস, তারপর টেইনে তুলিনাও"[৫]

এমন করেই কাঁকড়া ধরে সকাল থেকে দুপুর হয়ে অবেলা কাটতে থাকে মান্যর। এরপর বাড়ি ফিরে পলিথিনের প্যাকেটে রাখা কাঁকড়াগুলিকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ঢুকিয়ে রাখে। পরে সেই হাড়ির মুখ জাল দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখে। পরের দিন এগুলি নিয়ে সে বাজারে যায়। এভাবেই মা ও ছেলের জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে মান্যর মায়ের মতো কপাল সবার হয় না। কোনও কোনও মহিলাকে দেখা যায় কোলের শিশুকে নিয়েই জীবিকার সন্ধানে ছুটতে হয়।

'অন্নসত্র' গল্পে দেখা যায় নদেরানী স্বামী ভীমচন্দ্রকে হারিয়ে দুই ছোট ছেলে মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছে। তার স্বামী এক বাবুর অধীনে কাজ করতো। বাবুর যাবতীয় কাজ সে করে দিত। সেই বাবুর কথাতেই ভীমচন্দ্র জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে বাঘের হানায় জীবন দেয়। আর নদেরানীকে বসতে হয় পথে।

নদেরানী প্রথমে কিছু খয়রাতের আশায় সেই বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও কোনও লাভ হয়নি। বাবু অঘোর হালদার তার স্বামীর দোষ দেখিয়ে তাকে ফেরত পাঠায়। অথচ নদেরানী জানে এই বাবুর কথাতেই ভীমচন্দ্র ফরেস্ট অফিসারের দেখানো সীমানার বাইরে গিয়ে গাছ কাটতে গিয়েছিল। আর তাতেই বাঘের মুখে পড়ে ভীমচন্দ্রের জীবন যায়।

কোনও সাহায্য না পেয়ে নদেরানীকে নিজের জীবিকা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। সে অন্যান্য নারীদের মতো জঙ্গলে যেতে শুরু করল। সেখান থেকে ধানী ঘাস কখনও বা জঙ্গলের কাঠ নিয়ে নদী সাঁতরে এনে বিক্রি করতো। কিন্তু তার এই জীবিকাতে বাবুর দৃষ্টি পড়ে। ফলে জীবন আরও কঠিন রূপে দেখা দেয়।

'মউলে' গল্পে দেখা যায় ফুলকুসী তার স্বামী মাধাইকে হারিয়ে জীবন যাপনে ভয়ংকর বিপদে পড়েছে। মাধাই সাঁইদারের টাকার লোভে পড়ে মধু সংগ্রহ করতে একাই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। আর ডিঙি রেখে জঙ্গলে উঠতে না উঠতেই বাঘের থাবায় পড়ে। স্বামীকে হারিয়ে ফুলকুসী ওরফে ফুলিকে জীবিকার লড়াইতে নামতে হয়। সে প্রথমে মালোপাড়ায় অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে কাজের জন্য গেলেও

তার অল্পবয়সী শরীরের সৌন্দর্যের কথা ভেবে কোনও বাড়ির গিন্নিই তাকে বাড়িতে কাজ দিতে রাজি হয় না।

তবে ফুলিকে কাজ দিতে রাজি না হলেও তারা সকলেই ফুলির প্রতী সমব্যথী। তাই কোনও কাজ ছাড়াই কিছু পান্তা কচুপাতায় ফুলিকে দেয়। যা নেবে না নেবে না করেও আত্মসম্মানী ফুলি দুটি পেটের কথা ভেবে নিঃশব্দে তুলে নেয় এবং বাড়িতে এসে সেগুলি নুনু লঙ্কা সহযোগে অমৃত জ্ঞান করে ভক্ষণ করতে থাকে।

এরপর তার মাথায় ঘুরতে থাকে বাড়ির পোষা মুরগিগুলোকে বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাবতে থাকে খালে-বিলে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরবে। আর তা পুড়িয়ে খেয়েই পেট ভরাবে ছেলে ও মা। তাতেও যখন মন সায় দিল না ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয় মালো পাড়ার দেলো গাজীর কাছে। তার ছোট ছেলেকে বাঘ বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। মন্ত্র শিখে মা ও ছেলে ডিঙি নিয়ে পারি দেবে গেমোর ও গরানের জঙ্গলে। এরপর ছেলে মৌচাক ভেঙে আনবে আর ফুলি ছেলেকে পাহারা দেবে। কিন্তু তার এই প্রস্তাব মালো পাড়ার কোনও মাতব্বর মেনে নেয় না। সবাই তার কথায় হাসাহাসি করতে থাকে। কোনও নারী জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে আনবে এ তাদের কাছে বিশ্বাসের উর্ধ্বে। তাই প্রত্যেকেই ফুলিকে এই চিন্তা বাদ দিতে বলে। কিন্তু জীবিকাহীন নিরন্ন ফুলি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পিছিয়ে থাকতে বা বিলুপ্ত হতে চায় না। তাই এক সকালে ছেলেকে সঙ্গে করে ফুলি উপস্থিত হয় স্থানীয় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও বর্তমানে এমএলএ সত্যবন্ধু দাসের বাড়িতে। সেখানে ফুলি নিজের অর্থকষ্ট ও জীবিকায় বাধা দেওয়ার কথা জানালে এমএলএ সাহেব ফুলিকে জানায় অবশ্যই সে নিজের পেশা বেছে নিতে পারে। তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারোর নেই। এছাড়া তাঁর বক্তব্য --

> "গণতন্ত্র আছে না দেশে? ওরা সব ভেবেছেটা কি। তোমাকে তোমার বাঁচার অধিকার না দেওয়ার মানে কি জানো - গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা। না-না এসব ফাজলামো চলতে পারে না। যাই হোক দেশে একটা আইন আছে। সংবিধান আছে। সবার ওপরে মানুষের বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক রাইট আছে"[৬]

মূর্খ ফুলি এমএলএ সাহেবের সব কথা বুঝতে না পারলেও বুকটা তার ভরে ওঠে এই ভেবে যে এতক্ষণে সে একজন আপনজন পেয়েছে যে তার দুঃখ কষ্টের কথা বুঝতে পেরেছে। ফুলি তাই সাহেবকে এই কথা পাড়ার সকলকে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করে। তার জীবিকার পথে কেউ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সাহেবের পূর্ণ সম্মতিতে ফুলি হাসিমুখে ছেলেকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এরপর অপেক্ষা করতে থাকে সাহেবের সেই অর্ডারের জন্য। কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেলও সাহেবের কোনও অর্ডার এসে পৌঁছায় না। একদিন সাহেবের বাড়িতে আবার গিয়ে উপস্থিত হলে সেদিন আর এমএলএ সাহেবের সাক্ষাৎ পায় না ফুলি।

তবে এতো গেলো তাদের জীবিকার লড়াই। এর পাশাপাশি চলতে থাকে তাদের টিকে থাকার লড়াই। স্বামীহীন পরিবারে এই সব যুবতি মেয়েদের ভোগ করার জন্য একদল মানুষ লালায়িত হয়ে থাকে। তাদের নানারকম প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে না খেয়ে দেয়ে যখন এরা নিজেদের মতো করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলতে চায়। তখন এদের উপর শুরু হতে থাকে নানা রকম অত্যাচার।

'হেঁতালির মানুষেরা' গল্পে দেখা যায় নয়ানি তার একমাত্র বাসস্থানটি নদীগর্ভে হারিয়ে যখন আশ্রয় নিয়েছিল নদী বাঁধের উপরে। অপেক্ষায় দিন গুণছিল কবে তার চিহ্নিত হেঁতালের গাছটির বাসস্থান নদী জল থেকে উঠে আসবে। সরকারি সাহায্যের জন্য দরবার করছিল পঞ্চায়েতের কাছে। পঞ্চায়েত নয়ানিকে বেআইনি ঘর বেঁধে থাকার জন্য কোনও রকম সাহায্য করতে না চাইলেও একজন পঞ্চায়েত মেম্বার সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সে নয়ানিকে পরামর্শ দিতে থাকে এস্থানের বাস ছেড়ে তার চিহ্নিত স্থানে ঘর তুলতে। আর তার চোখ দুটো তখন ঘুরতে থাকে নয়ানির বুক দুটোর দিকে। নয়ানি সে কথার কোনও উত্তর দেয় না বরং নিজের বাসস্থান জেগে ওঠার অপেক্ষা করতে থাকে। আর এমন করে যখন সময় যেতে লাগলো অথচ নয়ানি ঘরের কোনও প্রমাণ দিতে পারল না। অথচ নদী বাঁধের থেকে উঠে যেতে পঞ্চায়েতের আদেশ আসতে থাকে বারে বারে। তখন সেই পঞ্চায়েত মেম্বার আবার এসে হাজির হয়। সে নয়ানিকে তার মৌজার একটা পড়ন্ত জায়গায় ঘর বাঁধতে বলে। এতে নয়ানি তার গোপন অভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে চিৎকার-চেঁচামেচি করে সেই মেম্বারকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। তখন সেই মেম্বারের চোখ মুখ থেকে আগুন ঝরে পড়তে থাকে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকে –

> "ঠিক আছে এই আমি দেখে নুব নয়ানি। তোর বিষ দাঁত যদি আমি না ভেইঙে ফেলি... ভালো কথায় তোর মন ভরলনি"[৭]

এরপরে নয়ানি তার জেগে ওঠা পুরনো জায়গায় আবার ঘর বাঁধতে শুরু করলে পঞ্চায়েত ও সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ মেম্বার নয়নিকে ঘর তুলতে বাধা দিতে যায়। কিন্তু হাতে দা নিয়ে অগ্নিমূর্তি এক নারীকে কাজ করতে দেখে আর কিছু বলার সাহস পায় না তার।

'জল-মানুষ' গল্পে ছয়ানির স্বামী বাঘের পেটে যাওয়ার পর পঞ্চায়েত সদস্য ভূষণ পাখিরা অনেকবার এই ছয়ানির কাছে ঘোরাঘুরি করেছে। ছয়ানি এসব বোঝে। আর বোঝে বলেই সে ভূষণ পাখিরকে এড়িয়ে চলতে চায়।

কিন্তু তাতেও কি বিপদ কম! বিপদ যে এমন নানা দিক থেকে আসতে থাকে। জলদস্যু ধরার জন্য পুলিশ অফিসার, পঞ্চায়েত ও গ্রামের অন্যান্যদের নিয়ে যখন ছয়ানির ঝুপড়ির কাছে উপস্থিত হয়। পঞ্চায়েত সদস্যের বারবার ডাকে ছয়ানি বেরিয়ে এলে পুলিশ অফিসারের চোখ ছয়ানির সারা শরীর বেয়ে বুকে দৃষ্টি স্থীর হয়। তার ঠোঁটও তখন লালসায় ভিজে উঠেছে। 'টর্চটা তখনও ফোকাস ফেলে রেখেছিল ছয়ানির বুকের ওপরে'[৮]। কিছুক্ষণ পর যদিও সেই অফিসার মুখে একটা লালসা মাখা হাসি নিয়ে ফিরে যায়।

'অন্নসত্র' গল্পে দেখা যায় নদেরানী স্বামী হারাবার পর বাবু অঘোর হালদারের নজরে পড়ে। অঘোর হালদার নদেরানীকে নিজের অধীনে পেতে চায়। এমন করে সে বহু বিধবা নারীকে নষ্ট করেছে। নদেরানীকেও সেই একই পথে নিয়ে যেতে চায় অঘোর। তাই নদেরানী নিজের মতো করে ধানী ঘাস বা জঙ্গলের কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাইলে সেই পথে বাধা দেয় অঘোর হালদার। নদেরানী জীবিকাহীন হয়ে পড়লে তাকে সরকারি সাহায্যের লোভ দেখায় অঘোর। অঘোর হালদারের কথায় গ্রাম প্রধান একদিন নদেরানীর বাড়িতে যায়। আর 'নদেরানীকে দেখেই প্রধানের চোখ নেচে ওঠে'[৯]। এরপর থেকে প্রতি সপ্তায় অনিল সামন্তর দোকান থেকে খয়রাতি সাহায্য আনতে বলে প্রধান। নদেরানী নিজেও

শুনেছে যাদের সারা মাসে দশ টাকাও আয় হয় না সংসারে, সরকার থেকে তাদের সাহায্য দেওয়া হয়। আর এ ব্যাপারে নামধাম ঠিক করে প্রধান।

নদেরানী এরপর সাপ্তাহিক সরকারি সাহায্য পেতে থাকলেও বিপদ বাধে বাবু অঘোর হালদার ও তার চামচা প্রধানকে কোনও রকম তোষামোদ না করায়। একদিন নদেরানীকে নিজের ঝুপড়ি থেকে ডাকাতি হতে হয়। রাত গভীর যখন তার দরজায় টোকা পড়ে। সে প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ঝাপের গায়ের আওয়াজ শুনে সে চমকে ওঠে। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে ঝাপটি ফাঁক করতেই –

> ‘‘তিন- চারটি হাত ওর বাহুমূলের নিচ দিয়ে ঘুরে আমচকা ওর সুগোল স্তনের নিচে জোঁকের মতো চেপে ধরে আর তারপরেই ও ফাঁকটি দিয়ে বেরিয়ে যায়।... শূন্য বাঁধের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে যখন বুঝল সে ডাকাতি হতে চলেছে।... চিৎকার করতে না পেরে অনেক কষ্টে একটা কালচে বাহুতে হুল ফোটায়; মোক্ষম কামড়-! বাহুর মালিকটি আর্তনাদ করে ওঠে ও তাকে আচমকা ছেড়ে দেয়; আর সেই সুযোগেই সে বাঁধেরগা বেয়ে গড়াতে গড়াতে একদম নদীর জলে’’[১০]

যদিও নদেরানীর পরে বুঝতে অসুবিধা হয়নি এ কাজ কাদের ছিল। তাই খয়রাতি সাহায্য আনতে গিয়ে লিস্ট থেকে তার নাম বাদ দেওয়ার কথা শুনে, প্রধানের বসে চা খাওয়া খোলা হাতের বাহুতে একটা গভীর অপুরানো ক্ষত চিহ্ন দেখে সে একে একে বুঝতে পেরেছিল বনদপ্তরে তার ধরা পড়া, বাবুর ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, লিস্ট থেকে নাম বাদ যাওয়া। এসবের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

‘মউলে’ গল্পে দেখা যায় ফুলি যখন তার ছেলেটাকে নিয়ে কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে তা নিয়ে ভেবে অস্থির। তখন রাতের অন্ধকারে তার ঝাপের দরজায় টোকা পড়ে। ফুলি তখন নিঃশব্দে ঘরে থাকা বঁটিটা হাতে তুলে নেয়। এরপর চিৎকার করতে যাওয়ার আগেই চৌকিদারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। এই চৌকিদার হলো সে অঞ্চলের প্রভাবশালী দীনু মন্ডলের এক চামচা। দীনু মন্ডলের নারী চালান ব্যবসা আছে। অঞ্চলের অল্প বয়সী স্বামীহারা মেয়েদের কাজ দেওয়ার নাম করে তাদের কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। এরপর আর তাদের খবর পাওয়া যায় না। ফুলি জানে এসব। তাই কাজের কথা বলে বাবু দীনু মন্ডলের বাড়ি ফুলিকে যেতে বললে ফুলি অগ্নিমূর্তি হয়ে বঁটি সোজা করে দরজার দিকে ছুটে যায়। চৌকিদার ভয়ে পালিয়ে যায়। যদিও গল্পে দেখা যায় ফুলির শেষ রক্ষা হয়নি। সে দীনু মন্ডলের ফাঁদে পড়ে। এরপর তাকেও বন্দী হতে হয় অঞ্চলের অন্যান্য বিধবা মেয়েদের মতো।

এভাবেই স্বামী হারিয়ে নারী যখন নিরুপায় হয়ে পরিবারের কথা ভেবে, নিজের সন্তানের কথা ভেবে নিজেকে জীবনযুদ্ধের সৈনিক করে তোলে। তখন তাকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। জলে বাগদার মীন ধরে যেমন জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তেমনি এ জীবিকায় আছে জীবনের ঝুঁকি। একবার কুমির বা কামটের মুখে পড়লে নিস্তার নেই। জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহী আগে সহজ থাকলেও বর্তমান বনদপ্তরের সময়পর্বে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কঠিনসাধ্য ব্যাপার। সে অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে রূপবতী মেয়ের কাজ হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে নারী যখন আকাশময় চিন্তায় মগ্ন। তখনও আশপাশের ক্ষমতাবান লোলুপ মানুষদের কাছ থেকে আসতে থাকে নারীর সম্মান রক্ষার চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জে যদি অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, চারপাশ থেকে আসতে থাকবে নানা ধরনের

সমস্যা। সরকারি সাহায্য বন্ধ হবে, কাজ পাওয়া যাবে না, রাতের অন্ধকারে ডাকাতি হওয়ার সম্ভবনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই পুরুষহীন বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম কতটা কঠোর ও কঠিন হতে পারে তা এই প্রবন্ধ বা শচীন দাশের সুন্দরবন কেন্দ্রিক কিছু গল্প পড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র, তাদের বাস্তব জীবনযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারি না।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবনের সততা', 'সুন্দরবন সমগ্র', আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৩০।
২. দাশ, শচীন, 'হেঁতালের মানুষেরা', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৪৪।
৩. তদেব, পৃ. ২৪৫।
৪. দাশ, শচীন, 'জল-মানুষ, 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৩৯।
৫. দাশ, শচীন, 'সবুজ কাঁকড়া, 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২০০।
৬. দাশ, শচীন, 'মউলে', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৯০।
৭. দাশ, শচীন, 'হেঁতালের মানুষেরা', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৪৯।
৮. দাশ, শচীন, 'জল-মানুষ, 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৩৯।
৯. দাশ, শচীন, 'অন্নসত্র, 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৪৫।
১০. তদেব, পৃ. ১৪৮।